-বিশ্বভারতী-

আমাদের এখানকার পরিচিত একজনের লেখা একটি 'ব্লগ' সম্প্রতি নজরে পড়লো। তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি', --বিশেষ ঝোঁক ঐ 'বিশ্ব' শব্দটির ওপরে-- বলা হয় কেন তা নিয়ে নারদোচিত কিছু চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রবাসজীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্য এধরণের চিন্তা তিনি মাঝে মাঝে প্রকাশ করে থাকেন। তিনি অনুজপ্রতিম তাই তার সুযোগ নিয়ে তাঁকে আগে বিশ্বনিন্দুক এবং বিশ্ববখাটে -- এই দুটি বিষয়ের ওপর গবেষণা করতে উপদেশ দেওয়া যেত, কিন্তু সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যহানির কারণে অহিংসাব্রত নিতে হয়েছে তাই তা আর করলাম না।তার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো আর একটি বিষয় মনে এলো, সেটি বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রনাথের বহুধাবিস্তৃত কৃতির মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও তাঁর কাছ থেকে সবচয়ে বেশী উদ্যম, উৎসাহ আর উৎকণ্ঠা দাবী করেছিলো, এটা অনস্বীকার্য। ১৩৪০ সালে জীবনসায়াহ্নে এসে 'আশ্রমবিদ্যালয়'-সংক্রান্ত চেষ্টা নিয়ে বলেছেন: 'পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি শেষ সীমা পর্যন্ত'। অথচ এই বিশ্বভারতী, এবং তারই গোষ্পদে বিশ্বভারতীর সৃষ্টি যার ভিত্তিতে, অর্থাৎ শিক্ষাসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তা এবং দুশ্চিন্তা নিয়ে আমরা খুব কম আলোচনার নমুনা পেয়েছি, নজর আকর্ষণ করার মতো কম। এমনকী দেশে প্রকাশিত বইপত্রের তালিকা ঘেঁটে বিশ্বভারতীর ওপর গবেষণামূলক তেমন কিছু পাওয়া গেল না -- স্মৃতিচিত্র অবশ্য প্রচুর। বিশ্বভারতীর সামান্য কয়েকজন প্রাক্তন/প্রাক্তনীদের (অন্তত আমি যাঁদের তা বলে জানি) সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ কিছু পাইনি।

কেবল একজন ছাড়া, তিনি আনন্দরূপ রায়, বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকেন। সম্প্রতি আমার সঙ্গে কথায় তিনি জানান যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী পরিচালিত এক বিদ্বজ্জনগোষ্ঠী বিশ্বভারতীর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কাজ করে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে। আনন্দরূপ সেই গোষ্ঠীর একজন না হলেও তাঁর চিন্তা ও মতামতের বহুল প্রতিফলন এই প্রতিবেদনে পাওয়া যেতে পারে। তখন আমার মনে হোলো যে আজকের এই সভায় বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গটির দিকে অন্তত সভাস্থদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে, হয়তো বা ভবিষ্যতে কোনোদিন বিশদভাবে আলোচনা হবে এই আশায়।

রবীন্দ্রনাথ যে স্কুল-পালানো ছেলে ছিলেন তা আমরা প্রায় সবাই জানি। কিন্তু কী কষ্ট পেয়ে তিনি তা করেছিলেন তা বুঝি যখন তিনি বলছেন :

''আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। . . . যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়।''

রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই বুঝেছিলেন তিনি কী শিক্ষা নিজে চাননি এবং অবশ্যই দিতেও চাননা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চল্লিশ :''. . . তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে''। তখন তিনি চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন তিনি কী শেখাতে চান। মনে রাখতে হবে তখন আমরা পরাধীন এবং ইংরেজী শিক্ষা পাথরের মতো আমাদের বুকে চেপে বসে আছে। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন: ''অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের এক সজীব ভূমিকা। . . . আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা।''

এই ''পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা'', অন্যত্র যাকে বলেছেন ''জীবনের সহিত সামঞ্জস্য''টা মুখ্য কথা। একে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে প্রাথমিক শিক্ষার মূর্তিটিকে মূর্ত করলেন। তার মধ্যে এলো ''গুরু'',''বিশ্বপ্রকৃতির ছোঁয়া'',''পরিবেশ রচনা ও পরস্পরের সেবা'',''উপকরণবিরল জীবনযাত্রা'',''একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্ব'',''সহযোগিতার সভ্যনীতি'',''আত্মকর্তৃত্বের বোধ'',''সবকিছুতে ঔৎসুক্য''। কম কথায় বললেন: ''ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে''। এর প্রতিটি শব্দ অর্থবহ এবং নিজে তার দীর্ঘ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৪ সালে মহর্ষির 'শান্তিনিকেতন'-এ এক ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রূপান্তরিত করলেন ১৩০৭ সালের ৭ই পৌষ উদ্বোধনীতে। এই প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণ এবং কার্তিক ১৩০৯ কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা (পত্নীবিয়োগের মাত্র দিন-দশেক আগে) একটা চিঠি, রবীন্দ্রজীবনীকার অনুমান করেন ''ইহাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম constitution বা বিধি''।

তারপর চলে তাঁর কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার এক সত্যিই মহতী প্রয়াস যার সঙ্গে মিশে ছিল দুঃখ-কষ্ট-লজ্জা-অপমানের ভার। মনে রাখতে হবে এটা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কথা -- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কথা। প্রয়োগাকর্মে থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিজে শিখেছেন, চিন্তার দিকপরিবর্তন হয়েছে যেমনটি বুঝেছেন। যথা দেখছেন যে, তাঁর চাহিদা মতো গুরু পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই তপোবন থেকে গুরুগৃহটা বাদ গেল। ১৩২৬-এ বলছেন: ''কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভপর নয়। . . . সেইজন্য এই বিদ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। . . . এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল . . .''।

বিদ্যালয় মোটামুটি চালু হবার পর রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে বাড়াবার কথা অর্থাৎ স্নাতক শিক্ষার কথা ভাবতে থাকেন। একটা বিস্তার সহজলভ্য: ''ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। . . . এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি

'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।''(বৈশাখ ১৩২৬)

দ্বিতীয়টির গভীরতা ও বিস্তার অনেক বেশী। ইতিমধ্যে নোবেল পুরস্কার তাঁর জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে, রবীন্দ্রনাথ বিদেশে গেলেন, বিশ্বকে জানলেন, সম্মান পেলেন। ''. . . য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। . . . দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।''(১৩২৮) অসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন: ''শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র করে তুলতে হবে -- ঐখানে সার্বজাগতিক মনুষ্যচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে -- স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে -- ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরেরই প্রান্তরে হবে। (লস্ এঞ্জেলস্, ১১ অক্টোবর ১৯১৬)

২৩শে ডিসেম্বর ১৯২১ (৮ই পৌষ ১৩২৮) বিশ্বভারতীর বাৎসরিক সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তা গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন: ''কিছুদিন থেকে এই বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিষ হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।''(পৌষ ১৩২৮)। মন্ত্র হোলো যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্।

তখন রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভার আকর্ষণে বিশ্বভারতীতে এসেছেন দেশ-বিদেশের গুণীজন। বিশ্বভারতীরও রম্‌রমা, কিন্তু অর্থকষ্ট অতি প্রকট, যদিও নতুন চিন্তার এই মহতী প্রকাশের প্রচেষ্টায় সমবেত গুণীজন তা মানিয়ে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আর সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ নেই আর, তাঁর বয়স বেড়েছে, বাইরের বিশ্বের চাহিদা বেড়েছে, আবার এক আকাশে দুই সূর্য ওঠে না, রবীন্দ্রনাথ একাজে তাঁর উত্তরাধিকারী পাচ্ছেন না, তৈরিও করছেন না। এমনটিই হয়। বিশ্বভারতীকে ধরে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ একা। বিশেষত এই কন্সটিটু্যশনের ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছে না:

''ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সে দিকেই [প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী] চলেছে বলে মনে হয়। . . . মাঝখানে এল কন্সটিটু্যশন। . . . আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কন্সটিটু্যশন . . . আমি বুঝতে পারি নে; সৃষ্টির কাজে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়।''

ভালো লাগছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি (যদিও ১৩৩৯-এ স্বীকার করছেন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী):

''. . . এখন অনেক ছাত্র, অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলেছে।. . . আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে?''(পৌষ ১৩৪২)

মৃত্যুর একবছর আগে ৮ই শ্রাবণ ১৩৪৭-এ প্রায় অনুনয়ের সুরে বলছেন: ''চল্লিশ বৎসর

পূর্বে যখন এখানে আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। . . . আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। . . . উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার [দুঃখস্মৃতির] সার্থকতা। আধুনিকযুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা–দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না--একে স্বীকার করে নাও।

সেই বছরই ভগ্নস্বাস্থ্য, মগ্নআশ রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে এক চিঠিতে বলেন ''Visva-Bharati is like a vessel carrying the cargo of my life's best treasure and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation" । মহাত্মাজী সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরে জানান ''You may depend upon me doing all I can in the common endeavor to assure its permanance.'' । ১৯৫১ সালে পণ্ডিত নেহরু ও শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ স্থির করেন যে গুরুদেবের (এবং মহাত্মার) ইচ্ছা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হবে আইন প্রণয়ন করে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীকে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা দেওয়া। পণ্ডিতজি এইসঙ্গে বলেন যে বিশ্বভারতী এক অনবদ্য কল্পনার অভূতপূর্ব প্রকাশ, একে যেন regimentation মারফৎ fall into a rut অবস্থায় না আনা হয়। সেই আইন প্রণীত হয়, বিশ্বভারতীকে সর্বভারতীয় গুরুত্ব দিয়ে তাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ত্ত্ব থেকে সরানো হয়। এই আইন সংশোধন করা হয় ১৯৬০, ১৯৭১ ও ১৯৮৪ সালে।

১৯৫১ সালে নবরূপে বিশ্বভারতীর যাত্রা শুরু, কবিগুরুর স্বপ্ন–কে বাঁচিয়ে রাখা একটি বড়ো উদ্দেশ্য। এটি ঠিক কী বস্তু তা নিয়ে অনেক তর্কআলোচনার ঝড় উঠেছে, কিন্তু বাগীশ্বর কবির বাগাড়ম্বর ভেদ করে তার সত্য রূপ নির্ধারিত করা গিয়েছে বলে মনে হয়না। ঝড়ের মেঘ জড়ো হতে আরম্ভ করেছে, আকাশ ভেঙে এসেছে ১৯৭০ সাল নাগাদ। তখন বিশ্বভারতীর কর্মসমিতি কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষ কমিটি -- প্রধান হলেন উপাচার্য প্রতুল গুপ্ত, সদস্যদের মধ্যে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় আর অমর্ত্য সেনের নাম আছে -- বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও পরিচালনা সংক্রান্ত ত্রুটি ও তাদের আশু সমাধানের প্রস্তাব দেন ১৯৭৩–এ। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কিছুমাত্র কাজ হয়নি এবং তার কোনো কপিও আজকাল পাওয়া যায়না বলে প্রকাশ। দুরারোগ্য ব্যাধির পূর্বলক্ষণ! ১৯৭১ সালে হীরেন মুখার্জি লোকসভার বিতর্কে জানান ''For years now, Visva-Bharati is going down the drain and nothing is being done by the government of the day... What is supposed to be an advanced center of philosophy is completely defunct. . . : ।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ১৯৭৪–এ জাস্টিস মাসুদের পরিচালনায় এক কমিটি গঠন করে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ কর্মধারা কী হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে জানতে চান। সেই কমিটি রিপোর্ট দেন ১৯৭৫–এ, তার কী হয়েছে আমার জানা নেই। বিশ্বভারতী যে আবার বিশবাঁও জলে পড়েছে তার হদিশ আমরা পাই প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইসাধন বসুর লেখা''ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী''বইয়ের মাধ্যমে। আরো অন্য ইঙ্গিতও থাকতে পারে।

২০০১ সালে ইউনিভারিসিটি গ্র্যান্টস্ কমিশন টি এন শেষনকে পুরোধা করে বিশ্বভারতীতে নতুন প্রাণ সঞ্চারের বিষয় বিবেচনা করার জন্য এক কমিটি গঠন করেন, ২০০৪ সালে তার রিপোর্ট পাওয়া যায়। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার জন্য তখনকার উপাচার্য সুজিত বসু আরেক কমিটি গঠন করেন রামরঞ্জন মুখার্জিকে প্রধান করে। ২০০৫ সালে তাঁদের রিপোর্ট হাতে পেয়ে বিশ্বভারতীর কার্যনির্বাহক সমিতি উপাচার্যকে যথাবিহিত কাজ করার অনুরোধ জানান।

ঐ একই বছর বিশ্বভারতীর নিজস্ব কমিটি তাঁদের পরিকল্পনা -- Comprehensive Perspective Plan for the Development of VB during 2005-2025'' প্রকাশ করেন। ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের (তিনি আবার বিশ্বভারতীর প্রধানও বা রেক্টরও বটে) পরিচালনায় এক হাই লেভেল কমিটি (HLC বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে) গঠন করেন পাঁচজন সদস্য নিয়ে, তাঁরা সবাই প্রফেসর। উদ্দেশ্য: বিশ্বভারতীর বর্তমান অবস্থা থেকে বিশ্বভারতীকে উন্নীত করে তাকে আবার জাতীয়/ আন্তর্জাতিক মহিমায় এবং সেণ্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য , ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির কাছে এঁরা এঁদের রিপোর্ট দিয়েছেন। ঠিক কবে হাতের কাছে তার কোনো হদিশ পাচ্ছিনা, এ রিপোর্টের গোমতীতীরে মরণ হবে কিনা তাও বলতে পারছি না। যাঁরা রিপোর্ট স্বচক্ষে দেখতে চান তাঁরা হয়

http://rajbhavankolkata.gov.in/ বা
http://www.visva-bharati.ac.in

দেখতে পারেন।

সম্প্রতি সাংবাদিক এডওয়ার্ড লুস আধুনিক ভারত সম্পর্কে লেখা একটি বইতে বলছেন যে কোনো সমস্যা যথাযথ পেকে উঠলে পরে ভারতবাসী তার মোকাবেলা করেন রিপোর্ট লিখে, বিধিমতো তর্ক করে ও আইন প্রণয়ন করে। তারপর সেই আইনের প্রয়োগ হোলো কী না হোলো তাতে কার কী এসে যায় -- আইন আছে, এটাই যথেষ্ট। ওপরের খতিয়ান পড়লে লুসের কথা মেনে নিতেই হয়।

এ ছাড়া তান লীর সম্পাদনায় শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ (উত্তর আমেরিকা শাখা) ২০০৬ সালে একটি বই প্রকাশ করেছেন, নাম ''এক সূত্রের সন্ধানে, A Common Concern: Rediscovering Tagore's Visva-Bharati'' । এই বইটিতে প্রাক্তন-প্রাক্তনীরা অনেকেই লেখা দিয়েছেন, তার কিছু স্মৃতিমন্থন আবার কিছুতে লিপিবদ্ধ আছে বিশ্বভারতীর বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধান নিয়ে তাঁদের চিন্তার ফল। বহুধাবিস্তৃত, এবং অবশ্যই নানান সমাধানের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু বহুধাবিস্তৃত দেখেই মনে হয় সমাধান অতি দুঃসাধ্য -- এ যেন অন্তিম অবস্থা, রোগের লক্ষণের বাহুল্যই রোগীর অবস্থা সম্পর্কে যা জানবার তা জানিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত আমার এই মত নিছকই sensationalism বলে যাঁদের মনে হচ্ছে তাঁদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

বিশ্বভারতীর বর্তমান পরিসংখ্যান দেখা যাক।

- ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা - ৬-৭০০০ (ছাত্র ও ছাত্রী মোটামুটি সমসংখ্যক), ছাত্র:শিক্ষক অনুপাত ১৩:১, সহায়ক কর্মী - ১৫০০-২০০০, বার্ষিক বেতন - ০-১০০০ ডলার (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)।
- ২, ৩/৪/৫, স্নাতোকত্তর, পি এইচ ডি দেওয়া হয়: Arts & Humanities ,Business & Social Science, Language & Cultural Studies, Science & Technology -তে।

- প্রবেশিকা পরীক্ষা আছে, আর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলও দেখা হয় (শতকরা ৩০ ভাগ সফল)।
- ইন্‌স্টিটিউট আটটি (বিদ্যা, শিক্ষা, সঙ্গীত, কলা, বিনয়, রবীন্দ্র, পল্লীশিক্ষা ভবন ও সংগঠন বিভাগ)
- স্কুল পাঁচটি (পাঠ ভবন, মৃণালিনী ও সন্তোষ পাঠশালা, শিক্ষা সত্র, উত্তর শিক্ষা সদন)
- সেণ্টার পনেরোটি (যথা নিপ্পন ভবন, শিল্প সদন, জঝ)
- আর্থিক অবস্থা (বিশ্বভারতী UGC-র কাছে টাকা পায়):
  ২০০৪-৫ সালে প্ল্যান-মাফিক (অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থার অনুকূল) প্রাপ্তি ১৬২ লক্ষ টাকা, খরচ ২৩০ লক্ষ। 'নন-প্ল্যান' অর্থাৎ বেতন আদি প্রাপ্তি ৪১ কোটি, খরচ ৪৮ কোটি টাকা। এছাড়া ুস্থ কিছু বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

এখন বিশ্বভারতীর বর্তমান পরিস্থিতি কী সেটা সংক্ষেপে দেখা যাক, HLC র রিপোর্ট ও 'এক সূত্রের সন্ধানে' থেকে কিছু প্রবন্ধের মারফৎ। একটা কথা বলে নিই। শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতী অনেক সময়েই সমার্থক করে দেখা হয়। আমি বলি কী যে শান্তিনিকেতন হোলো আধার, আর বিশ্বভারতী হোলো আধেয়। এই পার্থক্যটা, অন্তত চিন্তার ক্ষেত্রে, মনে রাখার প্রয়োজন আছে।

প্রথম যা নজরে পড়ে তা HLC র উক্তি -- বিশ্বভারতীর কাগজেকলমে, আইনগত ভাবে, মানচিত্র মারফৎ যাকে 'ক্যাম্পাস' বলা যায়, তার কোনো সঠিক সংজ্ঞা নেই। ১৯৫১-র আইনে নাকি ৩০০০ হেক্টেয়ার জমির সঙ্কেতমাত্র দেওয়া আছে, বিবরণ দেওয়া হয়নি। ১৯৮৯ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাঁদের ১৯৭৯-এর আইনের বলে SSDA - The Sriniketan-Santiniketan Development Authority নামের পর্ষদ গঠন করেন এবং সেই সংস্থার অধীনে বিশ্বভারতীর জমিও জুড়ে দেন। যেমনটি আশা করা যায়, মামলা মকদ্দমা সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়ায় এবং, পরিবেশপন্থীদের নৈতিক জয় হয়। এই রায়ের উদ্ধৃতি পড়ে দেখতে পারেন, এদেশে doublespeak যাকে বলে তার চূড়ান্ত উদাহরণ। অবশ্যই তাতে পর্ষদের কাজকর্ম খুব ব্যাহত মনে হয় না। শিবঠাকুরের আপন দেশে শেয়াল হল মুর্গীহাটার দারোয়ান এই আর কি !

দ্বিতীয় কথা বর্তমান বিশ্বভারতীতে পরিকাঠামোর জীর্ণ অবস্থা বা বহুক্ষেত্রে অনুপস্থিতি -- যথা অনাময় ব্যবস্থা(স্যানিটেশন) ও পয়ঃ-প্রণালী। তৃতীয়ত, কবির নোবেল মেডেলচোর পালাবার পরের বুদ্ধিবর্ধন -- সুরক্ষা। চতুর্থত, বিশ্বভারতীর বর্তমান সংগঠন যেখানে উপাচার্যের ওপর অসম্ভব চাপ পড়ে। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিশ্বভারতীর বাইশজন উপাচার্যের মধ্যে বারোজন প্রফেসর, এবং ১৯৭৫ সাল থেকে সব উপাচার্যই শিক্ষাবিদ। এছাড়াও HLC দেখছেন যে উপাচার্য ও শিক্ষকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকটা ভেদ গড়ে উঠেছে (বোধহয় প্রশাসনের কাজ করে তিনি আর সময় পান না)। বিশ্বভারতীতে শিক্ষক ও সহায়কদের সংখ্যার অনুপাত যথার্থ নয়, দ্বিতীয়টি মাত্রারিক্তভাবে বেশী। যেহেতু বিশ্বভারতী বোলপুরের বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের একমাত্র গতি, সেজন্য বিশ্বভারতীর কর্মীকুল স্থানীয় বাসিন্দাতেই ভারি এবং অবশ্যই 'ইউনিয়নিজম'এর ফ্যাকড়াও পুরো মহিমায় বর্তমান। কলা ভবন ছাড়া অন্যত্র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নতুন ছাত্র ভর্তি হয় 'ভেতর' থেকে -- অর্থাৎ প্রবেশিকা না দিয়ে বা প্রবেশের মানের প্রতি দৃক্‌পাত না করে। তারপর বিশ্বভারতীতে কী

পড়ানো হবে বা হবে না এবং শান্তিনিকেতন ছেড়ে অন্য কোথাও, যথা কোলকাতায় উপগ্রহ রাখা হবে কিনা তা নিয়েও প্রচুর মতানৈক্য আছে।

বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে HLC বহু সুপারিশ করেছেন, তার সারাৎসার ও বিশেষ কর্মসূচী নির্দেশ করেছেন । তার বিশদ আলোচনার সময় আমাদের নেই, বিশেষ আলোচনারও নয়। তার দুয়েকটি নমুনা দিচ্ছি, তাতেই ''মা কী হইয়াছেন''-এর আভাস পাওয়া যাবে।

- পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার আশু বন্ধ করা হোক।
- নেড়ী কুত্তার প্রকোপ দমন করা হোক।
- পরিদর্শকের আমন্ত্রণে আর একটি কমিটি হোক যাঁরা বিশ্বভারতীর ভূম্যধিকার ইত্যাদি নিয়ে সবাকার মতামত নিয়ে প্রস্তাব আনুন SSDA এবং বিশ্বভারতী পরিচালকরা conjoint planning করুন।
- স্বাধীনতার ষাট বছর পরে বিশ্বভারতীতে sewerage, drainage, sanitation নেই এটা তো অতি লজ্জার কথা।
- আইন সংশোধন করে অন্তত একজন সহ-উপাচার্যের পদ সৃষ্টি করা হোক।
- পাঠভবন আবাসিক হোক ও প্রবেশিকা আবশ্যিক করা হোক।
- বিদ্যা ও শিক্ষাভবন ইংরেজি-মাধ্যম হোক।
- লাইব্রেরি-তে spring-cleaning করা হোক।
- প্রাপ্ত অর্থের ২০% শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয় করা হোক। . . . ইত্যাদি, ইত্যাদি

অলমতিবিস্তরেণ!

আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পরিচয় আমার প্রথম যৌবনে, অভিভাবকদের রক্তচক্ষু এড়িয়ে সেখানে মানসীর সঙ্গে সময় কাটাবার ছুতোয়। মন তখন রমণী, রোম্যান্স আর রবীন্দ্রনাথে ভরপুর, কাজেই শান্তিনিকেতনের স্মৃতি সুখস্মৃতি। এখনো বন্ধুরা বলেন আমার টেগোরাইটিস আছে, তারই প্রভাবে আমি মনে করি সব বাংলাভাষাভাষীদের (এমনকী ঘোর নাস্তিক) কাছে শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকো, আর শিলাইদহ তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। আমি নির্বোধ, কেননা দেশের সুবোধ এবং অবোধরা সবাই একথা ভাবেননা। ভাবলে আরেক অযোধ্যার রামমন্দির ঘটিত হওয়া উচিত ছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি না যে আমরা এখানে পৌঁছলাম কী করে, যেখানে সাড়ে আটচল্লিশ কোটি টাকা বার্ষিক ব্যয় করেও আমাদের পলিথিন ব্যাগ, নেড়ি কুকুর নিরোধ আর বিদ্যাভবনের পাঠ্যসূচীর প্রয়োজন এক হাই লেভেল কমিটি গড়ে জানতে হয় ! বারবার জানতে হয়। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে এই সমস্ত সমস্যাটিকে নতুন আলোকে দেখার দরকার, সমাধানের জন্য দরকার বাক্সবহির্ভূত চিন্তা। ''এক সূত্রের সন্ধানে'' বইটিতে অশীন ও উমা দাশগুপ্তের লেখা প্রবন্ধটিতে(১৯৯১-তে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল) তার সামান্য নমুনা আছে, উৎসাহীরা পড়ে দেখতে পারেন, যদিও সেটি শেষ কথা নয়। মুস্কিল হচ্ছে এধরণের বাক্সবহির্ভূত চিন্তার যাদুকর যিনি ছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ আজ গত; তাঁর চিন্তাকে যিনি রূপ দিতে পারতেন সেই বাংলার বাঘও গত, শুধু তাই নয় সারা বাংলার ব্যাঘ্রকুলই আজ লুপ্তপ্রায়। কেন্দ্রীয় সরকারের বলে বিশ্বভারতী আজ অশ্বত্থামা, তার মৃত্যু নেই, নানা রোগভারে জীর্ণ হয়েও সে বেঁচে থাকবে। হয়তো আরেক হারকিউলিস আসবেন অজিয়ান স্টেবল পরিস্কার করার জন্য, তবে তা হবে আমার

নাতনীর কালের আগে নয়। তাতে তাঁর কিছু এসে যাবে না, তিনি চব্বিশ ক্যারাট বিদেশিনী।

তবে অঘটন আজও ঘটে। তার নমুনা আর আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইলো।

কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

[উৎস: শিক্ষার হেরফের, শিক্ষাসমস্যা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বিশ্বভারতী শীর্ষক রচনাবলী]

''আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য জঝ কে সাধন করিতে পারে। বাংলাভাষা, বাংলাসাহিত্য। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুদের স্বেচ্ছাপাঠ্য গ্রন্থ নাই।''

''অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তাহলে ছেলেবেলা থেকেই তাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না।''

''আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তাহলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। . . . এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবল–ভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল। . . . এই তো বাইরের বাধা! অপর দিকে আমার আর্থিক সঙ্গতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না।''

''ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছসাধন বুঝায় তাহা নহে। . . . প্রকৃতির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্যপালনের উদ্দেশ্য। . . . শুধু ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই।''

''শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। . . . এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই।''

'' . . . ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি।''

'' . . . সেই দিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ–সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। . . . এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের . . . ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত

করা চাই।''

''শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে। জঝ এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। (গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কবিজনোচিত মাত্র) ॥ জঝ এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।'' (১৩৪০ আশ্বিন)

''পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখিনি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি. . . সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্য সম্মেলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে।''(ফাল্গুন ১৩২৮)।

''. . . আমি বিশ্বভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। (ভাদ্র ১৩২৯)''

''বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়কে] ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। . . . সমবেত হন তা হলে তো ভালোই, . . . সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না।'' (আষাঢ় ১৩২৬)

''পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন একটা জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম, ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্ত মানুষ বলে দেখতে পাই।'' (বৈশাখ ১৩৩০)

''এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, . . . । কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। ''(পৌষ ১৩৩২)

''সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন . . . বাইরে আমরা দরিদ্র, কী দেখাতে পারি -- তবুও বন্ধুরূপে সাহয্য করেছেন।'' (পৌষ ১৩৪২)

''বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কী হবে। . . আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না।'' (পৌষ ১৩৩৯)

[ব্রজেন্দ্রনাথ শীল] ''শান্তিনিকেতনে naturalnees-এর স্থান হয়েছে, আশাকরি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneity-র বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে। য়ুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজমের দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interest-এ এরূপ একটা য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী-রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে। ''(পৌষ ১৩২৮)

''প্রথমে আমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। . . . কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু[?] মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। ''(পৌষ ১৩৩০)

(আশ্রমের রূপ ও বিকাশ লেখেন ১৩৪০ বঙ্গাব্দে; শিক্ষার হেরফের আর শিক্ষাসমস্যা ১২৯৯-১৩০০ তে)

(১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ১৩২৮ সালের ৮ পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদ্‌ সভার প্রতিষ্ঠা)

96000 google refernces to visva-bharati

wikipedia has a stub only

সুমিত রায়
নিউ জার্সি, মে ২০০৭